ঈদ মোবারক

গল্প

মনবৃত্ত

আজাদুর রহমান

এ ক বিষয় নিয়ে কামরুল বেশি দিন লেগে থাকতে পারে না। অস্থির মতির কারণে তেমন কিছুই করতে পারেনি সে। শুরুতে ভালোই সিরিয়াস থাকে, কিন্তু খানিক দূর এগোনোর পরই সে প্রজেক্ট পাল্টে ফেলে এবং হঠাৎ ফিউজ হওয়ার মতো দমে যায়। গা-ছাড়া ভাব কেন যে হয় কামরুল নিজেও আগ থেকে অনুমান করতে পারে না। এ যাবৎ নেয়া প্রজেক্টের সবগুলোই মুখ থুবড়ে পড়েছে। বন্ধুদের ধারণা কামরুল একজন ব্যর্থ মানুষ, তা না হলে সে পদে পদে ব্যর্থ হবে কেন? কামরুল অবশ্য নিজেকে পুরোপুরি নিরাশাবাদী মনে করতে পারে না। প্রজেক্ট চেঞ্জ করলেই তার হতাশা কেটে যায়। চোখেমুখে তখন নতুন করে আশার আলো ফুটতে থাকে। কামরুল তাই হাসিমুখে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যর্থতা আছে, তাতে কী? ব্যর্থতার সাথে বারবার বাজি ধরতে পারাও একটা যুদ্ধ, একটা যোগ্যতা। যারা আজো তার সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে তাদের ক'জন তার মতো বাজি ধরার সাহস রাখে? কামরুল হাল ছাড়ে না, বরং ব্যর্থতার সিঁড়িগুলো একাকী ডিঙাতে থাকে।

বিবিধ ব্যর্থ গল্পে ভরে আছে কামরুলের জীবন। যেমন মেট্রিকের পর তার মনে হলো আর গ্রামে নয়। এবার ঢাকার কোনো কলেজে ভর্তি হতে হবে। ভাবনামতো ভর্তিও হয়ে যায়। মেসবাড়িতে উঠেই ভালো ছাত্রদের মতো রুটিন লিখে ফেলে ফজরের পর দু'ঘন্টা ফিজিক্স পড়ে নাশতা, একটু রেস্ট করে ইংরেজি। ১০টায় অঙ্ক, গোসল করে নামাজ বাদ দুপুরের ঘুম... রাতে বাংলা, রসায়ন, বাদ এশা টিভি দেখে ঘুম। রুমটা গুছিয়ে নেয় সে। গ্লোসিপেপারে ছেয়ে দেয় দেয়ালগুলো। রুটিনটা স্টাডিটেবিল বরাবর সুন্দর করে সেঁটে দেয়। সব কিছু পরিপাটি হয়ে এলে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ঝুলিয়ে সে পড়তে বসে যায় এবং দু'দিন কঠোরভাবে পড়াশোনা করেই হাফ ছেড়ে দেয়। তিন দিনের দিন সে আর রুটিনটা ফলো করতে পারে না। মনটা খামোখা নস্টালজিক হয়ে যায়।

বিষণ্ন বিকেলে কামরুল মেস থেকে পিচরাস্তায় নেমে আসে। তারপর সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ি হয়ে সারা শহরে টো টো করে ঘুরতে থাকে। দিনমান চক্কর খেয়ে ক্লান্ত কামরুল পার্কের পাকা বেঞ্চিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। আকাশে মুখ রাখতেই গ্রাম্য দৃশ্যগুলো ছবি হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। শরতের সাদা আকাশ যেন প্রবলভাবে গ্রামে নিয়ে যেতে চায় তাকে। অজস্র শ্রাবণধারায় নদীর মন যেমন করে উথলে ওঠে তেমনি করে কামরুলের মনের ভেতর উথালপাথাল ঢেউ ওঠে। শহর কোনোভাবেই তাকে আর আটকাতে পারে না। কামরুল সোজা গাবতলী টার্মিনালের দিকে চলে যায়। রাত বাড়লে মেসমেটরা যতক্ষণে খুঁজতে শুরু করে ততক্ষণে সে উঠানে দাঁড়িয়ে মা মা করে হাঁক দেয়। তারপর মুখে হাসি এনে বলে মনটা খারাপ লাগল তাই ক'দিনের জন্য চলে এলাম মা। এরপর সাত দিনেও সে নড়ে না। অগত্যা বাবা ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা তোলে। দু-এক কথায় কথা চড়া হয়। কামরুল হৈ হৈ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় 'আর পড়াশোনা করতে পারব না। আমার পড়তে ভালো লাগে না।' তারপর দু'দিন আর বাড়ি ফেরে না। ক'দিন পর বাবা নতুন করে বোঝাতে শুরু করলে অনেকটা অনিচ্ছায় সে ঢাকার পথে পা বাড়ায়।

পুরনো মেসে ভাড়া বাকি পড়ে যায়। নতুন করে চেয়ার-খাট কিনে অন্য একটা মেসে উঠে যায় কামরুল। আবার রুটিনমাফিক পড়াশোনা শুরু করে বটে, কিন্তু পনেরো দিন পর সে কাউকে কিছু না বলে শেরপুরের এক আর্টিস্ট বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। তারপর বন্ধুকে সাথে করে গজনির পাহাড়ে হাতি খোঁজে। হাতির কবলে পড়া মানুষ খোঁজে। খুঁজে পেলে গল্প শোনে। পাহাড়িদের সাথে খামোখা পাহাড়ে পাহাড়ে কাজ করে বেড়ায়। মাস দুয়েক এভাবে পাহাড়ি-জীবন ভোগ হলে সে সোজা বাড়ি চলে আসে। বাবার কপালে নতুন করে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। কামরুল আগের মতোই হাসিমুখে ব্যাগ নামিয়ে বাড়ির বাইরে আসে। কয়েক দিন আর বাড়ি ফেরে না।

ফাইনাল পরীক্ষার মাসখানেক আগে কামরুল গার্জেনদের চাপাচাপিতে ঢাকায় গেলেও একদিন পরই কুষ্টিয়ার লালন আখড়ায় চলে আসে। আখড়ায় দিনকয়েক বাউলদের সাথে মজমা করে পুনরায় বাড়িতে ফেরত আসে। বাবাকে সোজাসাপ্টা বলে দেয় 'ভেবে দেখলাম পড়াশোনা করে লাভ নেই। বড় মানুষ হতে গেলে পড়াশোনা করার দরকার নেই। এখন থেকে আমি বাড়িতেই থাকব।' অনেক মিনতি-বিনতি করার পর সে পরীক্ষায় বসে। কোনো মতে পরীক্ষা দিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফেরে কামরুল। বন্ধুমহলে নরকগুলজার করলেও বলার কেউ নেই। নেশা বলতে সিগারেট। কিন্তু গ্রাম্য বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে জেদের বসে একদিন সবার চেয়ে বেশি পরিমাণ গাঁজা খেয়ে ফেলে কামরুল। এরপর ধীরে ধীরে আরো ভালো জিনিস চেখে নেয় সে। ডাল, চরস, মদ এমনকি হেরোইন পর্যন্ত। কামরুলের চ্যালেঞ্জ ছিল সে নেশা খাবে, কিন্তু নেশা তাকে খাবে না। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। সে যখন মনে করে নেশা করবে তখন বেদম নেশা করে। আবার যখন ছেড়ে দেয় তখন পুরোপুরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু কিছু দিন পর সে পুরোপুরি পাল্লায় পড়ে গেল। রাত করে বাড়িফেরা, বাবার তোয়াক্কা না করে উচ্চ শব্দে ব্যান্ডের গান, বেলা ১২টা পর্যন্ত ঘুম ইত্যাদি আচরণ এক সময় মামুলি হয়ে গেল তার কাছে।

তিন মাস পর রেজাল্ট বের হলো। কোনো মতে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করল কামরুল। অগত্যা গ্রামাঞ্চলের সস্তা কলেজে গ্রুপ পাল্টে ডিগ্রিতে ভর্তি হয় সে। বাবা শহিদুল ইসলামের স্বপ্ন ছিল ছেলে একদিন ডাক্তার হবে। বাবার স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়ে কামরুল কলেজের পাশে একটা টিনশেড ঘর ভাড়া নেয় এবং অভ্যেস মতো একদিন সব ছেড়েছুড়ে পুরোপুরি বোহেমিয়ান হয়ে যায়। চাকরি পাওয়ার নাম করে বাবার কাছ থেকে টাকা নিতে শুরু করে। টাকা শেষ হলে ফের হাত পাতে। চাকরি হয় না। বাবা একদিন প্রাইমারি শিক্ষকের পদে দরখাস্ত করতে বললে কামরুল চটে যায়। এত ছোটখাটো ফালতু চাকরি সে করবে, এ কথা বাবা ভাবল কী করে! তার সম্পর্কে তাহলে এই ধারণা। কামরুল যারপরনাই গালিগালাজ করতে থাকে। এভাবে বছর যায়। পাঁচ বছর। কামরুল বদলায় না। ছোটখাটো ব্যবসা কিংবা মুরগির ফার্ম বা এগ্রিবেজড় কোনো কিছু করতেও তার ইজ্জতে বাধে। ওদিকে বন্ধুরা সংসারের টানে একে একে সরে যেতে শুরু করে।

পুরোপুরি একা হওয়ার পর কামরুল একদিন ট্রাকের পেছনে উঠে পড়ে। নাটোর পার হওয়ার পর হেল্পার হামিদুল টের পায়, পাশে কেউ একজন ঘুমিয়ে আছে। সে হৈ হৈ করে ওঠে 'নাম, ব্যাটা নাম। করিছিস কী! নাম নাম।' হেল্পারের গুঁতানিতে কামরুলের মাথায় রক্ত উঠে যায়। হাতব্যাগের চেইন খুলে দোধারা চাকুটা হামিদুলের গলা বরাবর তাক করে চেঁচিয়ে ওঠে শুয়োরের বাচ্চা, একটা কথা বলবি তো গলা কেটে দুইভাগ করে ফেলব। ভড়কে যায় হেল্পার। মুখ দিয়ে কথা বেড়োয় না। কামরুল মুখটা নরম করে হামিদুলের কাঁধে হাত রাখে। হঠাৎ এমন রেগে যাবে সে বুঝতেও পারেনি। হামিদুলের ভয় এখনো কাটেনি। কাঁপুনি তুলে সে জিজ্ঞেস করে ভাইজান আপনের বাড়ি কোথায়? কামরুল অন্য কথা বলে খারাপ ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত। গত রাত থেকে কিছুই খাইনি। মাথা ঠিক ছিল না। এ পর্যন্ত বলার পর কামরুল বিজবিজ করতে থাকে বাপশালায় বোঝে না, জোর করেই পড়তে বলে। একবারও আমার কথা ভাবে না। পড়া বাদ দিয়ে যদি মাটি কাটতে বলত, দিনরাত মাটি কাটতাম। শালায় উল্টো বলল পড়াশোনা না করতে পারলে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যা। কিছু না পারলে ট্রাকের হেল্পারি কর। আমারে কিনা বলে হেল্পারি করতে। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে কামরুলের গলা ধরে এলো। হামিদুল কী মনে করে হাতটা চেপে ধরে। তারপর বলে, বাপে তো ঠিকই কইছে। একটা না একটা কাজ তো করতেই হবে। কাজের মধ্যে আবার ছোট-বড় কী, শরমের কী? এই আমারে দ্যাখেন ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার পর মনে হলো আমার দ্বারা এই কাম হবে না। আপনের মতো একদিন আমিও বাড়ি থেকে বেড়াই আইছি। আগে গ্যারেজে ছিলাম। দু'বছর হলো ট্রাকে উঠছি। দেশদুনিয়া দেইখ্যা বেড়াইতাছি বিনি পয়সায়। যেখানে রাইত সেখানে কাইত। খাওনে-পরনে কারোর বলার নাই।

মাঝরাতে ট্রাকটা কুষ্টিয়া টার্মিনালে ঢুকে পড়ে। হামিদুলরা ওস্তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। জামাল ড্রাইভার খেঁকিয়ে ওঠে ওই ব্যাটা হামিদুইল্যে, এডা ক্যাঠারে। হামিদুল ওস্তাদকে হাত ইশারায় একটু দূরে নিয়ে কানকথা বললে জামাল ড্রাইভার কামরুলকে ভালো করে দেখে নেয় 'তুমারে এই লাইনে আইতে কে কইছে, ভালো মাইনসের পোলা। আহো।' মদিনা হোটেলে খাওয়াদাওয়ার পর জামাল ড্রাইভার দাঁতে খিলান করতে করতে সিগারেট ধরায়। ওইদিকে কামরুলরা ট্রাকের আড়ালে গিয়ে বসে বসে সিগারেটে টান দেয়। সিগারেট শেষ হলে ওরা পেছনের ডালা বেয়ে ছাদের ত্রিপলে উঠে যায়। ট্রাক এক সময় ঝিনাইদহের দিকে বাঁক নেয়। মিশমিশে কালো রাত। তুফান বাতাসের সাথে কুয়াশা নামছে। ফাঁকা রাস্তা। দু-পাঁচ মাইলের মধ্যে কোনো মানুষের দেখা মিলছে না। রাত্রীকে ফেঁড়েফুঁড়ে দিয়ে ট্রাকটা ভোঁ ভোঁ শব্দে ছুটে চলেছে অচেনা এক জনপদের দিকে।

কিলো দশেক পর গাড়িটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। জামাল ড্রাইভার টলতে টলতে নিচে নেমে অকথ্য ভাষায় হামিদুলকে গালাগালি শুরু করে দিলো ওই খানকির পুত, বাকেট কাটলো ক্যামনে। এই হালা, পাছাটা বাইর কর দেখি একটা লাথি মাইরে তোর পাছার দাঁত খুলে চায়না বাকেট লাগাই। ট্যাকা কি তোরে কম দিছিলাম, দুই নম্বর মাল লাগাইলি ক্যানে। জামাল সত্যি সত্যি হামিদুলের পাছায় লাথি বসিয়ে দিলো। কামরুল কিছু বোঝার আগেই হামিদুল কানের কাছে গলা নামিয়ে আনলো কিছু মনে কইরেন না, ওস্তাদে মনে হয় মাল খাইছে। হামিদুল বাকেট লাগাতে আরম্ভ করলে জামাল কামরুলকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। তারপর সিট উল্টে মদের বোতল টেনে মুখে ঢালে। ঢক্ ঢক করে খানিক খেয়ে হাসতে হাসতে বোতলটা কামরুলের সামনে ধরে 'ভদ্রলোকের পোলা কামরুল্যা, অভ্যেস থাকলে লও।' অনেক দিন পর কামরুলের চোখের সামনে একটা চেনা ছবি ভেসে ওঠে। বোতলের অর্ধেকটা সে শেষ করে বলে, 'ওস্তাদ আমি তো শেষ করে দিলাম, আপনের আর লাগবে।' জামাল আনন্দমনে হাসতে থাকে তুমি আসনের আগে এক বোতল পুরো মাইরা দিছি। আজ আর লাগব না। এমন সময় হামিদুল হাঁক দেয় ওস্তাদ কমপ্লিট। কথাটা বলতে এসে হামিদুল বুঝে যায় যে ড্রাইভারের অবস্থা ভালো নয়। আতঙ্কিত গলায় সে ফিসফিস করে 'ওস্তাদ আজ ঝিনাইদহে রেস্ট নিলে হতো না। আপনের তো মনে হয় শরীর খারাপ।' জামালের মাথায় খুন চেপে যায় ওই হালা কুফার পুত। লিশে (নেশা) হলেই হালায় খালি প্যাঁচ দেয়। গালি সত্ত্বেও হামিদুল মিনমিন করে ওস্তাদ দোহাই লাগে, সাবধানে চলিয়েন। জামাল পুনরায় খেঁকিয়ে ওঠে বাইন্দির বাচ্চা কতা না বইল্যা পিছনে উঠ।

ট্রাক ফের চলতে শুরু করে। কামরুলের মাথাটা ঝিমঝিম করছে আর কেমন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে। জামাল ক্যাসেট ছেড়ে দিয়ে গলা মেলাচ্ছে এই পাড়ে আমি, ওই পাড়ে তুমি; মাঝখানে নদী ওই বয়ে চলে যায়। যশোর রোডটা ভারি সুন্দর। দু'পাশের সারবাঁধা গাছগুলো সত্যিই দেখার মতো। গাঁথানো গাছের ফাঁক দিয়ে ধু-ধু পাথারে জোসনা ঢেলে পড়েছে। অবারিত জোসনায় মুখ রাখতে গিয়ে গ্রামের ছবিটা পুনরায় ভেসে ওঠে। মনটা পুরোপুরি বিষণ্ন হওয়ার আগেই কামরুল জোসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সাঁই সাঁই গ্রামগুলোর নীরবতা ভাঙতে ভাঙতে আরো যশোরমুখী হতে থাকে ট্রাকটা। জামাল ড্রাইভার পান মুখে দেয়। খয়েরমাখা পান। তার গালসি বেয়ে পানের লাল ঝোল বেয়ে পড়ছে শার্টে। হেল্পার জামাল ড্রাইভার সম্পর্কে যা বলেছে তা ঠিক নয়। যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মদ খেলেই সে ভালো চালায়। ঝিকরগাছা পার হওয়ার পর গতি বেড়ে যায়। যেন হাওয়ার ভেতর উড়ে চলেছে ট্রাকটা। কামরুলের খুব ঘুম পাচ্ছে এখন। ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে কামরুল মনে মনে ঠিক করে নেয় কাল সে বাড়ি ফিরবে।

নির্বোধ

আন্তন চেখভ

ইউলিয়া ভ্যানিলেভনা। আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব তার ওপর। একদিন তাকে আমার পড়ার ঘরে তলব করলাম হিসেব নিকেশটা চুকপাক করার জন্য।

বল ইউলিয়া আমি বললাম। এসো হিসাবটা করে ফেলি। তোমার নিশ্চয়ই পয়সাকড়ির দরকার। কিন্তু তুমি এতই ব্যস্ত থাক যে তোমার বেতনটা পর্যন্ত চাইতে ভুলে যাও। তো ঠিক আছে মাসে তোমাকে তিরিশ রুবেলই দেয়া হবে।

চল্লিশ ।

না- তিরিশ। আমি লিখে রেখেছি। পরিচারকদের আমি সব সময় তিরিশ রুবেলই দিয়ে আসছি। তুমি এখানে দুই মাস আছো-দুই মাস পাঁচ দিন।

ঠিক ঠিক দুই মাস হিসাবও আমি লিখে রেখেছি। তার মানে তুমি ষাট রুবেল পাও আমার কাছে। এর মধ্যে নয় রোববার বাদ যাবে। রোববারগুলোতে তুমি কলিয়ার সাথে বসোনি। তুমি সে সময় বেড়াতে গিয়েছিলে। সেই সাথে তিনটি চার্চ হলিডে।

উত্তেজনায় সব শরীর কাঁপতে শুরু করল ইউলির। কোনো কথাই বের হলো না তার মুখ থেকে। তিনটি ছুটির দিন ধরলে বারো রুবেল কাটা যাবে। কলিয়া চার দিন অসুস্থ ছিল। ওই চার দিন তাকে তুমি পড়াতে পারোনি, শুধু ভারিয়া পড়েছে। তিন দিন তুমি ঘাড়ের ব্যথায় কাতর ছিলে। আর সে জন্য আমার বেগম দুপুরের খাবারের পর তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। বারো যোগ সাত তার মানে উনিশ। ওই দু'টি দিন বাদ দিলে তুমি পেতে যাও একচল্লিশ রুবেল, ঠিক বলছি না?

ইউলিয়া ভ্যানিলেভনার চোখ দুটো পানিতে চিক চিক করে উঠল। চিবুক শক্ত হয়ে গেল তার। হতাশায় কেশে উঠলো কয়েকবার। নাকে শব্দ হলো গর গর করে। কিন্তু কোনো কথাই বললো না সে।

নতুন বছরে একটি শশার চায়ের কাপ ভেঙেছো। এতে দুই রুবেল কাটা যাবে। অনেক দামি ছিল কাপটা। যাক, সে কথা না হয় বাদই দিলাম। তোমার অসাবধানতার কারণে কলিয়া কাঁধে চড়ে তার কোট ছিঁড়েছে। এর জন্য দশ রুবেল কাটা যাবে। তোমার অসতর্কতার কারণে ভারিয়ার জুতো জোড়া চুরি হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারে তোমার নজর রাখার কথা ছিল। তুমি একটা ছুটি কাটিয়েছো। তো সে জন্য কাটা যাবে পাঁচ।

দশই জানুয়ারি তুমি আমার কাছ থেকে দশ রুবেল ধার নিয়েছিলে।

আমি নিইনি। ফিস ফিস করে বললো ইউলিয়া।

কিন্তু আমি সেটা লিখে রেখেছি।

আচ্ছা ঠিক আছে।

একচল্লিশ থেকে সাতাশ বাদ দিলে থাকে চৌদ্দ।

দুচোখই পানিতে ভরে গেলো ইউলির। সুন্দর নাকের ডগায় দেখা দিলো বিন্দু বিন্দু ঘাম। বেচারী বালিকা! আমি একবারই মাত্র ধার করেছিলাম। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো সে।

আমি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে মাত্র তিন রুবেল ধার করেছিলাম। এর বেশি আমি মোটেই নেইনি।

ঠিক আছে। আমি তা লিখে রাখিনি। চৌদ্দ থেকে তিন বাদ দিলে থাকে এগারো। এই যে তোমার পারিশ্রমিক। তিন যোগ তিন যোগ তিন যোগ এক যোগ এক। তোমার টাকা শোধ।

আমি তার হাতে এগারোটি রুবেল দিলাম। রুবেলগুলো হাতে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে সে তার পকেটের মধ্যে রাখলো।

মাফ করে দিলাম-ফিস ফিস করে বললো সে।

আমি লাফিয়ে উঠলাম এবং ঘরের ভেতর পায়চারী করতে লাগলাম। অনেক কষ্টে ক্ষোভটাকে চেপে রাখলাম আমি।

কি মাফ করে দিলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বাদ বাকি...।

কিন্তু আমি তোমাকে প্রতারণা করেছি। আটকে রেখেছি। আমি তোমাকে অসমভাবে বঞ্চিত করেছি। তোমাকে ফাঁকি দিয়েছি। এত কিছুর পরেও কেন তুমি ক্ষমা করছো? কেন?

এতে আমার কিছুই হবে না।

কিছুই হয়নি তোমার! তুমি অবাকও হওনি? আমি তোমার সাথে একটু মজা করেছিলাম। নিষ্ঠুরতা কাকে বলে তা তোমাকে বোঝাচ্ছিলাম। আমি তোমাকে আশি রুবলই দিচ্ছি। এই খামের মধ্যে সবই আছে। কিন্তু মানুষ এতটা নিষ্ঠুর আর ফাঁকিবাজ হতে পারে কী করে? কেন তুমি প্রতিবাদ করলে না? কেন তুমি কিছুই বললে না? তুমি কি মনে করো, এই পৃথিবীতে সবকিছু সহজে হয়ে যায়? মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে?

মুচকি হাসলো সে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো আনন্দের ঝিলিক হ্যাঁ-এটিই সম্ভব।

এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। তাকে আশি রুবেলই দিলাম। ইউলিয়ার চোখে-মুখে তখন উজ্জ্বল আনন্দের হাসি। বুঝতে পারলাম- পৃথিবীতে কঠিন হওয়াটাই সবচেয়ে সহজ। আর সহজ হওয়াটাই কি সত্যই...।

অনুবাদ ঃ সুহৃদ সরকার